IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# Sudhangshu Kumar Chakraborty "Aranya Kanya": The Story of the dream breaks of Indiginous Women

# সুধাংশু কুমার চক্রবর্তীর "অরণ্যকন্যা" উপন্যাসঃ আদিবাসী নারীর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী

**ড. হরিপদ হেম্ব্রম**

**সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া**

*Abstract:*One of the most famous authors in Bengali literature is Sudhanshu Kumar Chakraborty. He was a Bihar cadre Indian administrative officer. In Bihar, several river dam projects were created in Santal Pargana and Chhota Nagpur. To remove and return to the project region, the indigenous people had to perform intricate and challenging labour in order to construct an industrial metropolis. The pursuit of literature has a consequence at the bottom of both public and private working life. "Aronya Konya" tells the terrible tale of the departure from the dwelling for reasons of excuse and the development of the indigenous ethnic groups. The rural Mahajan, Sudkhor, and British imperialism were the targets of the Santal uprising in India. However, despite India's freedom, its indigenous ethnic groups continued to face persecution. They still have their land from the 20th century. The Indian government has expelled the Tapashili ethnic group members in the name of a recent project and evicted the Bhavi sons in the name of development. The society and culture of the Santal ethnic group are depicted in the book. Tribal communities have lost their customary access to forest resources and are frequently displaced as a result of development projects. It was a novel about unmet expectations and crushed hopes called The Story of a Broken Dream. I'll attempt to talk about Sudhangshu Kumar Chakraborty's novel "Aranya Kanya" in this article, where he describes the lives of indigenous women's communities.

*Index Terms* - Tribal, Santal, Women, Culture, Soceity,Indigenous, rebellion, Broken , Dreams, Colonialism.

Discussion :সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী আশির দশকে একজন খ্যতিমান লেখক । তিনি বিহার ক্যাডারের একজন ভারতীয় অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছিলেন । বিহারে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন নদী বাঁধ প্রকল্প রচনা কালে শিল্পনগরী গড়ে তোলার জন্য আদিবাসীদের প্রকল্প এলাকা থেকে উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের কঠিন ও জটিল কাজ তাঁকে করেত হয়েছিল । জীবনে সরকারী ও বেসরকারী কর্মময় জীবনের তলে তলে তাঁর মধ্যে সাহিত্য সাধনার একটি ফল্গুধারা বর্তমান ছিল ।তাঁর 'অরণ্যকন্যা' উপন্যাস সাহিত্য সাধনারই ফসল । চাকরি জীবনে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা আদিবাসী সাঁওতালদের সম্বন্ধে আছে । সারা ভারতে আদিবাসীদের স্বস্থান থেকে উচ্ছেদ করার বহু নিদর্শন আছে । আদিবাসীদের উপর অনেক গবেষণা বই পাওয়া যায় । কিন্তু–

"তাদের জন্মভূমি থেক নিষ্ঠুরভাবে উচ্ছেদ ও পুর্নবাসনের নামে তাদের নানা দিকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার উপর কেউ বড় একটা রিসার্চ করেননি ।"[১]

এই উপন্যাসে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নের প্রয়োজন ও অজুহাতে বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার মর্মান্তিক কাহিনি চিত্রিত হয়েছে । পরাধীন ভারতে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল গ্রাম্য মহাজন, সুদখোর এবং ইংরেজমদতপুষ্ট দালাল, বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে । কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেলও ভারতের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা বহাল তবিয়তে অত্যাচারিত, শোষিত ও নির্যাতিত হয় । আজ একুশ শতকের যুগেও কি তাদের জমি জমা কেড়ে নেওয়া হয়না । স্বয়ং ভারত সরকার বিকাশের নামে ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ করে কলকারখানা, সেচ-প্রকল্পের নামে তপশিলী জাতিগোষ্ঠীর মানুষের উৎঘাত করে 'অরণ্যকন্যা' উপন্যাসে তারই একটা ট্রাজিক ছবি তুলে ধরেছেন । উপন্যাসে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে ।

এই উপন্যাসের আখ্যানের প্রেক্ষাপটে রয়েছে –

"চান্দোডীহ গ্রাম, ফুলহরনদী, বরবর পাহাড়, জঙ্গল ।"[২]

উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা দেখি চান্দোডী গ্রাম সংলগ্ন এলাকাজুড়ে সেচ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে । সেখানে সরকারের আধিকারিকরা চান্দোডি গ্রামে এসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে । প্লান্ট কারখানার গুরুত্ব সম্পর্কে সাঁওতালদের অবগত করানো হলে শিক্ষিত সাঁওতাল কন্যা পিয়ারী এর প্রতিবাদ করে । পিয়ারী পূর্ব ইতিহাসের কথা স্মরণ করে স্বজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের সচেতন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে । ঘটনা গড়ায় বিক্ষোভ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । তারা জানে প্রতিবাদ- প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে তার ফল ভয়ংকর হবে ।আবার আদিবাসীদের জমিহারা ভিটেহারা হতে হবে । সাঁওতালরা জানে মাটি সাঁওতালদের মা । সেই মাকে যারা কেড়ে নেয় তাদেরকে 'বিটলাহা' করে । সরকারীবাবুরা উন্নয়নের প্রকল্পের সুবিধা জানান দেওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসী রমণীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে । শেষ পর্যন্ত দিকুদের হাত থেকে মা মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন – প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে –

"নেরা নিয়া নরু নিয়া
ডিঁডা নিয়া ভিটা নিয়া
তবে দেবোন হুল গেয়া বো ।"[৩]

এই কথাগুলোর অর্থ হল –

"মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে
ভিটে মাটি রক্ষার্থে
আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাবো ।"

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে মূলত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর উপর অন্যায়- অত্যাচার- অবিচারের কলকাঠি চালানো হেয়েছে । ঔপন্যাসিক সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী সাঁওতালদের সংগ্রাম আন্দোলনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন । তাদের সমাজজীবনের খুঁটি নাটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে উপন্যাসে । উপন্যাসের সাঁওতালদের পুরাণ কাহিনির সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে –

"ঠাকুর জীউ ঈশ্বর প্রথমে সৃষ্টি করেলন জলের জীব ।"[৪]

উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতালদের ধর্মীয় বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, দেব-দেবীর, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আচার আচরণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে । তাদের ধর্মীয় দেব-দেবীর প্রতি যে বিশ্বাস, তারই বর্ণনা আছে –

"একদিকে চলতে লাগল দেব-দেবীর পূজা অমঙ্গল অপসারণের জন্য বঙ্গাদের পরিতৃপ্তির জন্য মুরগি, পায়রা, ছাগল বলি দেওয়া হয় জাহের থানে ।"[৫]

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র উঠে এসেছে। আশির দশকের এক উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী। তার 'অরণ্য কণ্যা' উপন্যাসে বৃহৎ শিল্প ও নদীসেচ প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজনে ও অজুহাতে সারা ভারতের আদিবাসীদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার মর্মান্তিক কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । উচ্ছেদের মর্মান্তিক কাহিনী ছাড়াও আর একটা বলিষ্ট সুন্দর বিরোধের প্রচেষ্টার রূপও দেখা যায় এই উপন্যাসের কাহিনীতে । ১৮৫৫-র সময়কালে সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল গ্রাম্য মহাজন, সুদখোর, এবং মহাজনদের পক্ষে দাঁড়ানো ইংরেজ-শাসক ও শাসনের বিরুদ্ধে । আজ স্বাধীন ভারতে জমিদার নেই, মহাজনী প্রথাও নেই কিন্তু আজ কি সাঁওতালদের অবস্থা ভালো হয়েছে । আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কি তাদের জমি জায়গা কেড়ে নেয় না, স্বয়ং ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার উন্নয়নের নামে বিকাশের নামে নিজভূম

থেকে উচ্ছেদ করে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নদী-সেচ প্রকল্পের নামে আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর মানুষের উৎখাত করে । এই উপন্যাসে তারই একটা ট্রাজিক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন । উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজ জীবনে অভিঘাত এবং সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র বিস্তৃতভাবে ধরা পড়েছে।

এই উপন্যাসে কাহিনীতে দেখা যায় আদিবাসীদের জন্মভূমি থেকে নিষ্ঠুরভাবে উচ্ছেদ ও পুর্ণবাসনের নামে তাদের নানাদিকে ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে । সুধাংশুশেখর চক্রবর্তীর এই উপন্যাস থেকে ট্রাজিক ও মানবিক চিত্র পাওয়া যায় । উচ্ছেদের মর্মান্তিক কাহিনী ছাড়াও আরও একটা বলিষ্ট সুন্দর বিরোধের প্রচেষ্টারহ রূপও দেখা যায় । এর আখ্যানে যে প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু এই উপন্যাসে পিয়ারী এক অরণ্যকন্যা । লরজম ডি, চান্দোডি, সাঁওতাল গ্রাম সংলগ্ন প্রায় এক হাজার একর জায়গা জুড়ে প্লান্ট-কারখানা হওয়ার প্রস্তাব আসে । এই গ্রামে প্রায় একশ সাঁওতাল পরিবারের বসবাস । সরকার ঠিক করেছে এই এলাকা থেকে আদিবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । সরকারের আধিকারিকরা শাল-মহুলের জঙ্গলে চান্দোডিহির গ্রামে এসে প্লান্ট-কারখানার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে । কিছু পিয়ারী, পিয়ারীর ঠাকুরমার নেতৃত্বে দিয়ে এলাকার সকল আদিবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তাদের মুখে ধ্বনিত হয় –

> "এই চান্দোডীহ গ্রাম, ফুলহর নদী, বরবরু পাহাড়, জঙ্গল, ঠাকুরজীউ তাদের জন্য তৈরী করেছেন সেখান থেকে তাদের কে সরাতে পারে যারা চেষ্টা করবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"[৬]

উপন্যাসে আখ্যানে দেখা যায় ডেপুটি কমিশনার সহ চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনুধাবন করেন আদিবাসী সাঁওতালরা বিক্ষোভ বা বিদ্রোহের ডাক দেয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে । তাঁরা জানে মাটি সাঁওতালদের মা- সেই মাকে যারা কেড়ে নেয় তাদেরকে বিটলাহা করে । আদিবাসী সাঁওতালরা সমাজের কঠিন অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিটলাহা করে । বিটলাহার দিন ঠিক হলে হাটে, গ্রামে-গ্রামান্তরে শাল পাতার ডাল নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকে । এই বিটলাহা প্রথা মূলত আদিবাসী সাঁওতালরা দিকুদের হাত থেকে নিজেদের মেয়েদের সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রবর্তন করেন । আদিবাসী সাঁওতালরা –

> "নেরা নিয়া নুরু নিয়া
> ডিঁডা নিয়া ভিটা নিয়া –
> সেদায় লেকা বেতাবেবৎ এঞাম রুয়ড়ে লাগিৎ
> তবে দেবোন হুল গেয়া হো ।"[৭]

এই কথাগুলোর মানে হলো –

> "স্ত্রী পুত্রের জন্য
> জমি জায়গা বাস্তুভিটার জন্য
> হায় হায় । এ মারামারি এ কাটাকাটি
> পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
> আমরা বিদ্রোহ করব"[৮]

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন যা পিয়ারীর ঠাকুরমার পিয়ারীকে শুনিয়েছিল –

> "ঠাকুর জীউ (ঈশ্বর) প্রথমে সৃষ্টি করলেন জলের জীব – কাঁকড়া, কুমীর, কচ্ছপ, চিংড়ি, কেন্নো । তারপর তিনি শুরু করলেন দুজন মানুষ সৃষ্টি করতে – কিন্তু তাদের প্রাণ দেওয়ার আগেই সূর্যের ঘোড়া তাদের মেরে ফেলল । তারপর সৃষ্টি করলেন হাঁস-হাঁসানি পাখি । পাখির ডিম থেকে জন্ম নিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ।"[৯]

আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর হিহিড়ি পিপিড়িতে থাকত – জঙ্গলের ফলমূল খেত । লিটা নামে এক বুড়ো মানুষ ঠাকুরদার পরিচয় দিয়ে তাদের মদ খাওয়ালো । তারপরে পরেই তারা ভাগ হলো সাতটি দলে । হাঁসদা, হেমব্রম, মুর্ম্মূ, কিস্কু, মান্ডী, সরেন, টুডু । একই দল বা গোত্রের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হত না । হিহিড়ি পিপিড়ি থেকে খোজ-কামান । সেখানে তারা গরু-ছাগলের মতো থাকতে লাগলো । ঠাকুরজীউ তাদের উপর ভীষণ রেগে যায় । সেখান থেকে তাদের হারাতা বরুতে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে প্রবল অগ্নিবৃষ্টি শুরু হল, সব মানুষ, জন্তু জানোয়ার পুড়ে ছাই হয়ে গেল । তারপর বৃষ্টি ও বন্যা । হারাতায়

সাঁওতালদের এক নূতন প্রজন্ম সৃষ্টি হল সৎ, সুষ্ট, বলিষ্ট । আগের সাতটি গোত্র ছাড়া আরো পাঁচটি গোত্রে ভাগ হল – বাস্কে, বেসরা, চঁড়ে, বেদিয়া এবং গোঁড়িয়া । সাঁওতালরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতে লাগল । তাদের আরাধ্য প্রধান দেবতা মারাং বুরুর দেখানো রাস্তায় অবশেষে চাম্পা দেশে যা বর্তমানে বিহার প্রদেশে এসে উপস্থিত হয় ।

উপন্যাসে অষ্টম পরিচ্ছেদে আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামের জমি জোর করে দখল করার সরকারী সিদ্ধান্তের খবর গ্রামগুলিতে পৌঁছাতে লাগলে সাঁওতালদের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে যায় । সাঁওতালরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা জমি ছাড়বে না । একদিকে তার জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগল । এখানে তাদের ধর্মীয় দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ধরা পড়ে –

> "একদিকে চলতে লাগল দেব-দেবী পূজা, অমঙ্গল অপসারণের জন্য – বোঙাদের পরিতৃপ্তির জন্য মুরগি, পায়রা, ছাগল বলি জাহের থানে ।"[১০]

জাহের এরার পূজো দেওয়া, বাদামি রঙের মুরগি বলি দেওয়া হয় । নায়কে কুডাম নায়কেরা, দিনের পর দিন পূজো করে চলে, পূজা হয় মারাং বুরুর, ফুলহর নদীর অধিষ্টাত্রী বোঙার, ধানক্ষেত রোয়া ধানের, উপদারের, সারজম দারের, সাঁওতালরা সারি সারজম অর্থাৎ শালবৃক্ষের ছায়াতলে জাহের কুচ্ছে ভগবান আছেন বলে বিশ্বাস করেন । তারা বিশ্বাস করেন ভগবান আছেন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালার তটে তটে । মানবের গৃহে গহে, সারি সেবীর পর্ণকুটিরে । ঈশ্বর আছেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে । তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন বিশ্বের অনু-পরমাণুতে ।

উপন্যাসের আখ্যানে দেখা যায় সেদিনকার সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল গ্রাম্য মহাজনদের শোষনের বিরুদ্ধে এবং মহাজনদের পক্ষে দাঁড়ানো ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে । স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জমিদার নেই, মহাজনী প্রথাও আপাত দৃষ্টিতে বে আইনী । কিন্তু আজ কি আদিবাসী সাঁওতালদের অবস্থা কিছু ভালো হয়েছে । আজকের যুগে দাঁড়িয়েও কি তাদের উপর শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চণা বন্ধ হয়ে গেছে । স্বয়ং ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার বিকাশ-উন্নয়নের নামে, নদী সেচ প্রকল্পের নামে, কারখানার নামে, কর্মসংস্থানের অজুহাতে আদিবাসীদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ হয়েছে । তারই একটা ট্রাজিক চিত্র দেখিয়েছেন ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অরণ্যকন্যা পিয়ারী কিস্কু সাঁওতাল কন্যা । সাঁওতাল মেয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের স্কুলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহন করার সুযোগ হয় । সেই সুবাদেই ইংরাজী ও বাংলা ভালোই শিখেছে । শিক্ষিত হয়েছে । স্কুলের মাদার, সিস্টাররা, বন্ধুরা পিয়ারীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে । পিয়ারী অনুধাবন করে তাদের পূজা-পার্বনের সঙ্গে গির্জার পূজা-পার্বনের কোনো মিল নেই । তার বেশিরভাগ বন্ধুই আদিবাসী সাঁওতালদের –

> "জাহের থান বোঙ্গা, ঠাকুর জীউ নিয়ে ব্যঙ্গ করে – তাদের মতে সাঁওতাল মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে – খ্রীষ্টান না হলে, প্রভু যীশু আর মেরীর শরণ না নিলে তাদের উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই নেই ।"[১১]

খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে থেকে পিয়ারীর কথায়, বলায়, চলায় এসেছে সাগর পারে ছোঁয়া । গানে মিশে গেছে বিদেশী সুরের রেশ । আর নিজের অজান্তেই সে লড়াই করে চলেছে তার স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য । একদিকে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্টীর পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস, গাছপালা, বনজঙ্গল ও মাটি দিয়ে গড়া তার সত্তা আবার অন্যদিকে বাইরে থেকে বয়ে আনা আলোর ঝলকানি । এই উপন্যাসে সাঁওতাল কন্যাকে আমরা বিভিন্ন অনুভূতির ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে পাই ।

ঔপন্যাসিক স্বয়ং বিহার ক্যাডারের একজন ভারতীয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ছিলেন । বিহারের সাঁওতাল পরগনার ও ছোট নাগপুরের বিভিন্ন নদী-বাঁধ প্রকল্প রচনাকালে শিল্প নগরী গড়ে তোলার জন্য আদিবাসীদের প্রকল্প এলাকা থেকে উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের কঠিন ও জটিল কাজ তাঁকে করতে হয়েছে । সারা ভারতে আদিবাসীদের স্বস্থান থেকে উচ্ছেদ করার বহু নিদর্শন আছে বৃহৎ শিল্প ও নদী-সেচ প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজনে ও অজুহাতে । এই উপন্যাসে তারই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । উপন্যাসের আখ্যানে পাওযা যায় সিমরি, চিরোডিহি, লোহাখেলা, পাহাড়পুর, মনটিপা, ডাংগরডিহ, পলাশ বেড়িয়া, শিমুলিয়া নামে সাঁওতাল গ্রামের জমি নেওয়া হবে চন্দ্রাহার সম্প্রসারণের জন্য । এরই বিরুদ্ধে পিয়ারী এবং ললিত এলাকার আদিবাসী ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ না হওয়ার জন্য আদিবাসী সাঁওতাল ভাই বোনদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলে –

> "খাঁটি গেবন হুলগেয়া হো,
> খাঁটি গেবন হুল গেয়া হো

দেশ দিশম দেশ মাজহি পারগানা
নাতো নাতো মাপাজিকো
তবে গে বোন হুল গেয়া হো ।"[১২]

অর্থাৎ

আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করবো
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করবো
দেশের মাঝি ও পারগানা
গ্রামের মোড়লরা,
তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব ।

কেবল হুল করবো – বিদ্রোহ করবো – এই শ্লোগান বা আওয়াজেই সে বিদ্রোহের স্বার্থক রূপ দেখা দেবে না । এ বিষয়ে সুচিন্তিত পথ আবিষ্কার না করতে পারলে, সৃষ্টি হবে না নানা ধরণের অন্ধ সংগ্রাম এবং তার পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হবে ভাবতে পারা যায় না । এরই মধ্যে গঠনমূলক প্রচেষ্টা কিছু দেখা যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পিয়ারী কিস্কু এবং ললিতের মধ্যে । তারা বিশ্বাস করেন নিরুপদ্রব, অহিংস, সত্যাগ্রহের একটা পথ মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশে যা দেখিয়েছিলেন । সেই অহিংস সংগ্রামের ভিত্তি হল জনগণের ঐক্য । হিন্দু মুসলমান, আদিবাসী, বনবাসী, জনজাতি, উপজাতিদের সম্মিলিত প্রতিরোধ । এই গঠনমূলক বিপ্লবের পথে হেঁটেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অরণ্য কন্যা পিয়ারী কিস্কু । আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাঁওতাল তরুণীর অনুধাবনে আজ কেবল উৎপাটিত আদিবাসী ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয় । বোধ হয় ভারতের গোটা জাতটারই পুনর্বাসনের তাগিদ উপস্থিত । পিয়ারীর মতে সমাজতন্ত্রে সর্বজাতীয় পুর্নবাসনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে । কাজেই ব্যাপারটা শুধুমাত্র আদিবাসীদের নয় । ব্যাপারটা সর্বভারতীয় । একটা টোটাল রেভুল্যুশনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে ধীরে ধীরে – যে বিপ্লবের মূল্যবোধ আলাদা, যে বিপ্লবের সাফল্য আলাদা । অরণ্যকন্যা পিয়ারীর চেতনায় নতুন ধরণের সভ্যতার জন্মবেদনা অনুভূত হচ্ছে । এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক এই মানবিক চিত্রটা তুলে ধরেছেন । কেবল সংখ্যাতত্ত্ব নয় । সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষ – এক আদিবাসী নারীর চেতনা, বেদনা ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যানের বয়ান নির্মান করেছেন।

## আকরগ্রন্থঃ

১) চক্রবর্তী ,সুধাংশু কুমার , 'অরণ্যকন্যা' এস. আর পাবলিকেশন , প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস , ১৯৮৮ পৃষ্ঠা – ভূমিকা অংশ
২) তদেব , পৃষ্ঠা -৬৩
৩) তদেব , পৃষ্ঠা- ৪৬
৪) তদেব , পৃষ্ঠা - ৪৮
৫) তদেব , পৃষ্ঠ- ৪৯
৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩
৭) তদেব,পৃষ্ঠা -৪
৮ ) তদেব,পৃষ্ঠা -৪
৯) তদেব ,পৃষ্ঠা -৩৬
১০) তদেব,পৃষ্ঠা -১১৯
১১) তদেব,পৃষ্ঠা -৪৩
১২) তদেব,পৃষ্ঠা -২০২

## সহায়কগ্রন্থঃ

১) বন্দ্যোপাধ্যায় ,সুমহান, প্রসঙ্গ আদিবাসী, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -২০১২

২) বসু , তাপস , সম্পাদিত আরণ্যকের অনন্যতা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬

৩) বাস্কে , ধীরেন্দ্র নাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খন্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭

৪) বাস্কে , ধীরেন্দ্র নাথ , সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯

৫) বাস্কে , ধীরেন্দ্রনাথ, বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক্ বৈদিক প্রভাব, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৯২

৬) বাস্কে , ধীরেন্দ্রনাথ , সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, সন্তোষী প্রিন্টার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ পরিবর্ধিত সংস্করণ, মে ২০০৩